International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

লোকায়ত ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথের গান

ড. শ্রাবণী সেন
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (সঙ্গীত বিভাগ)
তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, তারকেশ্বর, হুগলী

বলা যায় লোকায়ত মানুষের জীবনধারার দর্পণ হল লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের মাধ্যমেই একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তার আত্মপ্রতিকৃতি আঁকে। লোকের পরিচয় তৈরী হয় লোকসংস্কৃতিতে এবং তা গড়ে ওঠে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে। লোকসংস্কৃতির যে কোন উপাদানের পাঠ তাই সামাজিক বা সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা নির্দিষ্ট বার্তা বহন করে। লোকসংস্কৃতি তাই শুধু সাহিত্য বা শিল্প নয়, তার পাঠ তৈরী হয় সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, নানারকম ব্যবস্থা বা আত্মপরিচয়ের দাবিতে প্রাসঙ্গিকতায় ও তাৎপর্যে। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি যেমন একটি গোষ্ঠীর অর্ন্তগত সংযোগ প্রক্রিয়া, তেমনি সেই গোষ্ঠীর গোষ্ঠী চেতনা এবং আত্মপরিচয়ও তার মাধ্যমে প্রসারিত হয়। লোকসমাজের জীবনধারার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই লোকসংস্কৃতির অন্তভুর্ক্ত।

লোকসংস্কৃতি চর্চা একটি জাতির আত্মানুসন্ধানের বড় দিক। লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক রূপ ফুটে ওঠে লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। লোকসংস্কৃতি সমাজের মধ্যেই প্রবাহমান, যার কোন প্রামাণ্য ভিত্তি বা লিখিত রূপ নেই।

আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির উৎস গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায়। ইউরোপে যাকে Lok song বলা হয় আমাদের দেশে তা লোকসঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের লোকসঙ্গীত একলার গান হলেও আমাদের দেশে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমবেত ভাবটাই বেশী লক্ষ্য করা যায়। লোকসঙ্গীতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানেও সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও গ্রাম নির্ভর সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসঙ্গীতের একটা নিবিড় যোগ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই গ্রাম নির্ভর সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে সঙ্গীতের সংগ্রহের প্রতি গভীর ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। পল্লীবাংলার সহজ সরল জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করত। এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করে তিনি তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জারি রেখেছেন। ফলে একদিকে কবির প্রকৃতি প্রেম অন্যদিকে দার্শনিক ভাবনা কবিকে

আরও বেশী লোকসংস্কৃতিমুখী করে তুলেছিল। পল্লীগ্রামই বঙ্গ তথা ভারতের যে ভিত্তি ভূমি তা কবি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

কবিগুরু তাঁর জীবনের বেশ কিছু কাল অতিবাহিত করেন রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, শিলাইদহ ও বীরভূমের নানা পল্লী অঞ্চলে। জমিদারি দেখা শোনার সুবাদে ঐ সব অঞ্চলে বসবাস করার সময়ে ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকশিল্পীদের লোকসংগীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে মূলত সুরগত ও বিষয়গত এই দুই ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সুরগত প্রভাব অর্থাৎ লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার গানের সুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানে লক্ষ্য করা যায়। আবার বাউল তত্ত্ব বা কীর্তনাঙ্গের কিছু প্রচলিত গানের বিষয়গত সাদৃশ্য ও চিত্ররূপ তাঁর গানে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে লোকায়ত সুর, বিশেষ করে কীর্তন ও বাউল এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সারি, ভাটিয়ালি, মিশ্র কীর্তন, ঢপ কীর্তন ও মনোহর শাহী কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলার লৌকিক সঙ্গীতের সুর রবীন্দ্রনাথের গানে সর্ব পরিব্যপ্ত। দেশী লৌকিক সুরকে তিনি যে রূপদান করেন তার মধ্যে মিশে ছিল তাঁর স্বকীয়তা।

বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির মূলে আছে এক সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে কীর্তনে নানা রূপ দেখা দিয়েছে। নগরসংকীর্তন, পদাবলী গান, ভাঙাগান, ঢপকীর্তনের রূপ থেকে রূপান্তরে মাটির কাছাকাছি লোকসঙ্গীতের আত্মীয় হয়ে উঠেছে কীর্তন। বলা যায় যে সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে কীর্তনের জন্য তার মধ্যেই লোকায়তের বীজ উপ্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমশ্র সঙ্গীতের আনন্দ, তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।'' 'কখনও তিনি কীর্তন গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন ভাব প্রকাশের গভীর ও নিবিড় নাট্যশক্তি।' আবার 'সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি' অথচ সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা বলেই কীর্তন তাঁর ভাল লেগেছে। কীর্তনের ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করেছেন 'রাগরাগিণীর' রূপের প্রতি তাঁর মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক এবং মনে হয়েছে' এই কীর্তনের সঙ্গীত অপরূপ। কিন্তু সঙ্গীত যুগ্মভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবে এর সার্থকতা। আসলে বলা যায় কীর্তনের স্পর্শে রবীন্দ্রগীতি আত্মবিম্ব দেখেছে। সেইজন্য খাঁটি রাবীন্দ্রিক গানে কীর্তনের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও তাৎপর্যে গভীর।

লোকায়ত ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথের গান

বাংলা পদাবলীর ছন্দঝংকার ও ধ্বনি লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে কৈশোরকালে রবীন্দ্রনাথ মহাজন পদাবলীর অনুকরণে তাঁর ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম গান-গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে কিংবা জয়দেবের নামসমেতং কৃতসংকেতং—এর অনুকরণে ভানুসিংহের সতিমির রজনি সচকিত সজনী রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের গানে লোকায়ত সুরের প্রথম আবির্ভাব তাঁর মাত্র ষোল বছর বয়সে রচিত গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে এই গানে। গানটির সুরে কীর্তনের সুর অতি স্পষ্ট। তাই আমরা বলতে পারি কীর্তনের সুর রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলের অগ্রজ।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উপাদান কীর্তন। শিলাইদহ বাসকাল 'কীর্তনে আর বাউলের গানে' তাঁর মনের নিভৃত তাঁর গুলো, শুধু বেজে উঠেছিল তাই নয়, তাঁর সৃষ্টি উৎসের যে পরিপূর্ণ তাম্বুরা, কীর্তন তার অন্যতম তারে পরিণত হয়েছিল। তাই দেখতে পাই শেষ জীবনের সুর নিয়ে তাঁর গানে নানা নতুন প্রয়াস চলেছে। 'তবু মনে রেখো' গানে গূঢ় আর্তিতে মনে রাখার অনন্তিম বিনতি তার অন্ত্যঃস্তলে সুরে ভাঁজে ভাঁজে কীর্তনের স্বকরুণ মূর্চ্ছনা বেজে উঠেছে। রাগ-রাগিণী মেনেও সুরের এই মর্মস্পর্শী সারল্য ও লোকায়ন রবীন্দ্রনাথের গানে সুনিশ্চিত ভাবে কীর্তন জাত।

কীর্তন গান রচনায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা পাওয়া যায় গানের বাণী ও ভাবের গভীর আবেগে। কীর্তনের আখর খুব বড়ো শিল্প কৌশল। রবীন্দ্রনাথ যে সব কীর্তন গান লিখেছিলেন তাতে তেমন ভাবে আখর প্রয়োগ করেন নি। কীর্তনের আখরকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কথার তান'। আখরের কাজ মূল গানের ভাষ্য রচনা নয়, বরং মূল গানের অবগুণ্ঠিত মাধুর্যের ব্যঞ্জনাকে ফোটানো। তাঁর প্রথম রচিত দুটি কীর্তনাঙ্গ গান হল—আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। আখরযুক্ত এই কীর্তন রচনার নেপথ্যে ছিল শিলাইদহের কীর্তনীয়াদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ আখরযুক্ত কীর্তন গান লেখেন এবং আখরবিহীন কীর্তন গানে আখর যোগ করে গানকে নতুন রূপ দেন। যেমন নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে (১৩০৫), মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (১৩০৫), ওহে জীবন বল্লভ ওহে সাধন দুর্লভ (১৩০৫), আমি সংসারে মন দিয়েছিনু (১৩০৬), আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি (১৩০৮) প্রভৃতি গানে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের গানে ফুটে উঠেছে খাঁটি রাবীন্দ্রিক ভাব ও রূপ। এ সব গানের অর্ন্তগূঢ় মর্মার্থ হল কথা ও সুরের অভিন্নতা এবং সুর স্পন্দের নেপথ্যে ধ্বনিত কীর্তন ও বাউল গানের মিলিত অঞ্জলি।

রবীন্দ্রনাথের গানে পাই লোকায়ত কীর্তনের প্রভাব, যাকে বলে ঢপকীর্তন। শাস্ত্রীয় কীর্তনের জটিলতা থেকে মুক্ত এবং রাগরাগিণীর বিচিত্র সূক্ষ্মতার বাইরে এক সময় সরল কীর্তনের ধারা বাংলায় প্রবাহিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্তন প্রভাবিত গানে তালফেরতার রীতি বর্জন করে ঢপকীর্তনের রীতিতে রচনা করেন—'ওকে বল সখী বলো', 'কেন মিছে কর ছল'—মায়ার খেলার এই গানে মধুকানের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মাত্র দুটি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত মানসে কীর্তনের প্রভাবিত 'তুক' রীতির প্রভাব দেখা যায়। 'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি', 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল' গানে। প্রকৃতির গানে কীর্তনের সুর ধরা পড়ে—'তুমি কোন পথে যে এলে পথিক/আমি দেখি নাই তোমারে' গানে।

কীর্তন রচনার মূল উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। রবীন্দ্রনাথের বেশীরভাগ গান কীর্তনাঙ্গ গানে আত্মনিবেদনের গভীরতার সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের আত্মোন্মোচনের মাধুর্য পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। গানের অনুসঙ্গে বাঁশির সুর, নিভৃত কুঞ্জ, যমুনা জল, মরমিয়া সখী এবং নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলনের চিত্রকল্প থাকলেও ভাবের দিক থেকে এ সব রচনা পদাবলীর অনুসৃত যেমন নয়, সুর ও রূপবন্ধের দিক থেকেও নয়, নিছক কীর্তন।

কয়েকটি কীর্তনাঙ্গীয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ—

ওই আসন তলের মাটির পরে (কাওয়ালি)
না চাহিলে যারে পাওয়া যায় (দাদরা)
আমার মল্লিকা বনে (দাদরা)
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল (৫/৫ছন্দ)
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক (একতাল)
বাংলার মাটি বাংলার জল (একতাল)

লোকায়ত পর্যায়ের আরেকটি গীতশৈলী হল বাউল গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তনের সুর থেকে বাউল সুরের ব্যবহার কম লক্ষ্য করা যায়। তবে বাউলের ধর্মভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে যতটা দেখা যায়, চৈতন্য প্রভাবিত ও পদাবলীকীর্তন প্রভাবিত বৈষ্ণবতার স্থান রবীন্দ্রসঙ্গীতে ততটা নেই। রবীন্দ্রনাথের বাউল আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে লালন ফকির। শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ লালন অনুগামী কবির সৃজনশীল মন ও মননকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। লালনের গানে, কথায় এবং উপলব্ধ সত্যে ধ্বনিত হয়েছে যে মন্ত্রবর্জিত আত্মচেতনার সম্প্রসারণের মূল্যবোধ, সেই মানবিক মূল্যবোধ যে ভাবে জীবনধর্ম লোকায়ত ও সৃজনশীল

সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করেছিলেন আত্মিকভাবে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ভূক্ত আউল কুবীর গোঁসাইয়ের—'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন' গানটির সুর কাঠামো লক্ষ্য করা যায় কবিগুরু রচিত—'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' গানটিতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" লোকায়ত ধর্ম-সংস্কৃতিতে গৌণ বা বিচ্ছিন্ন ভাবনার প্রয়াস বলে মনে করেন নি। বরং তিনি ভারতবর্ষীয় ধর্ম চেতনার অভ্যন্তরীণ প্রবাহের প্রাণময় সত্তা হিসেবে মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের মিলন মেলায় বাউল ও বাউলগান হয়ে উঠেছে বাংলার লোকসংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক।

ড. শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন—''বাউলগানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত সমাজে তাহার কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশী বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ রস পিপাসু কবিচিত্ত অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ বলিয়া অবহেলিত অনেক রচনায় নব নব সৌন্দর্য্য প্রাকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের রস সম্পদ বহুগুণিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দিয়াই আমরা বাউল গানের আতীন্দ্রিয় রস অনুভব করিতে শিখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে বাউল গানের প্রভাব সামান্য নয়। বাউল গানের সংগ্রহেও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমত ও শ্রেষ্ঠতম।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় লোকায়ত সুরের আশ্রয়ে গান রচনায় জোয়ার আসে। সাধারণের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরের অনেকগুলো স্বদেশীগানে সহজিয়া রীতির সুর ও আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। তিনটি বাউল গানের হুবহু অনুসরণ করে রচনা করেন—আমার সোনার বাংলা (আমি কোথায় পাব তারে), যদি তোর ডাক শুনে (হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে), এবার তোর মরা গাঙে (মন মাঝি সামাল সামাল)। লোকজীবনে কীর্তনের সুর অন্যান্য গানের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে অনেকে ক্ষেত্রে বাউল ও কীর্তন সুর আলাদা করা যায় না। বাউলের মধ্যেও কীর্তনের সুর অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে সব বাউল গানের সুরকে ব্যবহার করেছেন, তাতে কীর্তনের মিশ্ররূপ পাওয়া যায়। যেমন প্রকৃতি পর্যায়ের গানে বাউলের সুরও প্রযুক্ত হয়েছে—পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে গানে। ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে হঠাৎ ডাক পড়ে—এ

বেলা ডাক পড়েছে গানটিতে। বসন্তের গান—ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—গানে পাওয়া যায় বাউল সুর ছন্দের প্রত্যক্ষ পরশ। মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাতি, বর্ষার এই ছবি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে বাউল সুর-ছন্দের দোলায়। বর্ষা যেন বাউলের মত একতারা বাজিয়ে চলেছে, এমনও কল্পনা করেছেন কবি—বাদল বাউল বাজায় রে একতারা। বাদল দিনের আরও গানে পাওয়া যায় বাউল সুর-ছন্দের ছোঁয়া—সেই বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধ্যাবেলায় নিজেকে মনে হয় বলরামের চ্যালা। বনের কিনারে বসন্তের হঠাৎ ফাগুনসম দেখা দেওয়ার গান-তুমি কোন পথে যে এলে পথিক গানে। বিচিত্র পর্যায়ের এক গানে কবি বলেছেন—যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বটে। বাউল ছাড়া অন্য লোকায়ত সুর রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত হয়েছে স্বল্পই। সারি ভাটিয়ালি প্রভৃতি নদীকেন্দ্রিক মাঝিমাল্লার গানের সুর রবীন্দ্রনাথের গানে পাওয়া গেলেও বাউল সুরের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। সারি গানের সুরে রচনা করেন—এবার তোর মরা গাঙে, রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেন—আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল শিল্পসংস্কৃতি চেতনা ও উৎসব ভাবনার এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা পৌষ মেলা। বাউলের দর্শন ও সঙ্গীত সাধনাকে নাগরিক জীবন আত্মিক ভাবেই মর্যাদা দিয়েছে। ধন্য আমরা যেখানে রবীন্দ্রনাথ ব্রাত্য লোকায়ত মানব প্রেমিক সহজিয়া সাধকদের আত্মদর্শন ও সঙ্গীতের সুর-বাণীর মাধুর্যকে পৌষ মেলার মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

কয়েকটি বাউলাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ—

ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি।
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে।
ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়।
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।
এই তো ভালো লেগেছিল।

তথ্যসূত্র: ১। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।
২। শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসঙ্গীত।
৩। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)।
৪। শ্রী অমল মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা।
৫। সুভাষ চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথের গান ও অন্যান্য।
৬। লীনা চাকী—রবীন্দ্রনাথ ও বাউল।